ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব, নীতি ও পদক্ষেপসমূহ: একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ মনজুর কাদির*

সারসংক্ষেপ: বাংলায় ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানি শাসনভার গ্রহণ করার পরও শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবক্ষয় থামেনি। গোড়ার দিকে কোম্পানি দেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন থাকে। মেজর বি.ডি বসুর মতে, কোম্পানি ছিল নিছক একটি বণিক প্রতিষ্ঠান। লাভ লোকসান ছাড়া তারা আর কিছুই বুঝত না। সুতরাং রাজস্ব থেকে প্রজাদের শিক্ষার জন্য কিছু ব্যয় করাকে তারা অপব্যয় মনে করত। কোম্পানির পরিচালক সভার জনৈক সদস্য এজন্য মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়দের শেক্সপীয়ার পড়ানোর জন্য অর্থব্যয় করার দরকার নেই। কোম্পানির শিক্ষাবিস্তারে অবহেলার অপর কারণ ছিল যে, ভারতীয়দের শিক্ষা ও ধর্মব্যবস্থায় হাত দিলে ভারতীয়রা বিদ্রোহ করতে পারে এই আশঙ্কা পরিচালক সভা পোষণ করতেন। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ নীতির মূল্যায়নে এই মনোভাবের পরিচয় মেলে: 'to leave the traditional modes of instruction undisturbed and to continue to them the support which they had been accustomed to receive of from the Indian rulers'.[১] এছাড়া শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় পুরনো রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ফলে বাংলা তথা ভারতীয় সমাজজীবনে যে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তাতে বুদ্ধিবৃত্তি, শিক্ষাদীক্ষা ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়। সর্বোপরি, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন শাসকগোষ্ঠী যুদ্ধ, ব্যবসায়িক জটিলতা, রাজস্ব ও বিচারব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, নীতি উদ্ভাবন ও নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি কাজে অর্থাৎ নিজেদের টিকে থাকার সংগ্রামে এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে, প্রাথমিকভাবে শিক্ষার প্রতি কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষার সুযোগ হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে ইংল্যন্ডে কোনো সমন্বিত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার নজির না থাকার কারণে পৃষ্ঠপোষকতার বেশি কিছু আশা করা যায় নি। বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিদেশিদের প্রথম আগত বণিক হিসেবে আরবদের মত ইংরেজদেরও বাণিজ্যতরী প্রথমে বাংলার মাটিতে নোঙর করেছিল। ১৬৯০ সালে জব চার্নক সূতানটী, গোবিন্দপুর ও কলকাতা ক্রয় করে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭১৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট ফররুখ শিয়রের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিমকে পরাভূত করে এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ফরমানের বলে দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব আদায়ের মালিক হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে কোম্পানি বাংলার সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করে।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বাংলার নতুন শাসকেরা ভারতীয় বিদ্যাচর্চার পুনরুজ্জীবনের প্রতিই তাদের দৃষ্টি প্রথম নিবদ্ধ করেন। ১৭৮০ সালে কলকাতার মুসলমানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সর্বপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মাদ্রাসাটি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফারসি ও আরবি ভাষায় এবং মুসলিম আইন শাস্ত্রে (ফিকাহ্) শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করা, যাদেরকে সরকারি অফিসে ও বিচারালয়ে নিম্নপদে নিয়োগ করা যাবে। বিশেষত মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তারা কাজ করতে পারবেন।"— to promote the study of the Arabic and Persian languages, and of Muhammaden law, with a view more specially to the production of qualified officers for the Courts of Justice.[২] এছাড়া বাংলার মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়কে খুশি করার উদ্দেশ্যও ছিল, কারণ তাঁদের সন্তানদের জন্য সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হেস্টিংসের এ সকল কাজের মাধ্যমে এটাও স্বীকৃত হল যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সকলেই আশা করছিল।

এক দশক পরে ১৭৯২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জনাথন ডানকান হিন্দুদের শিক্ষার জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল, তা কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হতে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। আরও পরে এলফিনস্টোন হিন্দুদের শিক্ষার জন্য পুনাতে একই কাজ করেন। অপরদিকে স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রাচ্যবিদ্যার ওপর গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ন্যাথানিয়েল হেলহেড বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। চার্লস উইলকিন্স বাংলা ভাষায় ছাপার হরফ তৈরি করেন। এর ফলে বাংলা ভাষায় বই ছাপা সম্ভব হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃক শিক্ষার এই পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সদ্য ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় শাসকদের তুলনায় নিতান্তই সামান্য এবং এর সুফলও ভোগ করছিল খুব কম সংখ্যক ছাত্র।

১৮০০ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি কর্তৃক কলকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অভ্যন্তরভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কলকাতা মাদ্রাসা ও জোনাথন ডানকানের বেনারস সংস্কৃত কলেজের মতো ওয়েলেসলির এ কলেজ পরিপূর্ণ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং এই কলেজের দ্বারও সাধারণ ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। ওয়েলেসলি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নবাগত ইউরোপীয় অফিসারদেরকে ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস ও শাসনশৈলী সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় কলেজটি উঠে যায়। এর পর হতে ইংল্যান্ডের হেইলবেরি কলেজে ভারতে নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের পড়াবার ব্যবস্থা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন হলেও এই কলেজের শিক্ষক ও প্রাক্তন বিদ্বান ব্যক্তিগণ বাংলাসহ ভারতের প্রায় সকল ভাষার সংস্কার ও আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কলেজের বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন রামরাম বসু,

তারিণীচরণ মিত্র ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এ সকল পণ্ডিতের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকগণ বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন ও বাংলা গদ্যরীতি প্রবর্তনের কাজে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেন।[৩]

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার

কোম্পানি সরকার প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নানা কারণে দেখা দেয়। প্রথমত, রুজি-রোজগার, চাকরি ও ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য এক শ্রেণির লোক ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি-সরকারেরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কেরানি, দোভাষীর কাজ, নকল-নবিসের কাজের জন্য ইংরেজি-জানা বহু লোকের দরকার হয়। কিন্তু বাস্তব কারণেই ইংল্যান্ডে থেকে বেশি বেতন দিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আনা কোম্পানির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় কম বেতনে ইংরেজি-জানা দেশীয় লোকদের চাকরি দিতে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইচ্ছুক ছিল। একারণেও অনেক লোক ইংরেজি শিখতে আগ্রহ দেখায়। আলেকজান্ডার ডাফের মতে, লোকে রাস্তা-ঘাটে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু মননশীল, জ্ঞান-পিপাসু নব্য শিক্ষিত স্থানীয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখান। তাঁদের ছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান-পিপাসা। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজ জাতি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোরে ভারতবর্ষকে পদানত করে শাসন করছে, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসী চর্চা না করলে ভারতীয়রা চিরকাল পিছিয়ে থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝে এ সকল মননশীল ব্যক্তি ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় মিশনারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় নব্য শিক্ষিত বাঙালি ও তাঁদের ইউরোপীয় সহযোগীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরি, জন মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, চার্লস গ্রান্ট, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, আলেকজান্ডার ডাফ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের স্মরণীয় অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়।[৪] কাজেই এটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় আন্দোলনের সূচনা অবিভক্ত বাংলাদেশেই; রামমোহন রায় ছিলেন যার পুরোধা।

বেসরকারি উদ্যোগ: কোম্পানি-সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার আগেই বাংলাদেশে বেসরকারি স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। আর.সি. মজুমদারের মতে, কোম্পানি-সরকারের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়াই বেসরকারি প্রচেষ্টায় ইংরেজি-স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কিছু উদ্যোগী লোক কলকাতায় ইংরেজি-স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলোর মধ্যে হেনরী ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমি এবং জোড়াসাঁকোতে অবস্থিত শের বোর্নের স্কুলটি বিখ্যাত ছিল। নব্য বাংলার বহু মনীষী শের বোর্নের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ শের বোর্নের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল ব্যতীত ১৮০০ সালে ভবানীপুরে একটি ইংরেজি-স্কুল স্থাপিত হয় এবং ডেভিড হেয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় পটলডাঙ্গা একাডেমী বা বর্তমান হেয়ার স্কুল। পরের বছর হেয়ার ইংরেজি এবং বাংলা

পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বুক সোসাইটি হতে সুলভ মূল্যে পাঠ্য-পুস্তকসমূহ স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা হত।

এভাবে ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠার ধারণাটি বাস্তব রূপলাভ করে এবং ভারতে ইংরেজি শিক্ষার পরিকল্পনা সবার সমর্থন লাভ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের উদ্যোগে ডেভিড হেয়ার, বৈদ্যনাথ মুখার্জী, রাধাকান্দ দেব প্রমুখের আনুকূল্যে ১৮১৭ সালে কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক দিকচিহ্ন ছিল। এই কলেজে কলকাতার ভদ্র হিন্দু ঘরের সন্তান-সন্ততিরা পাঠগ্রহণে উৎসাহ দেখালে ইংরেজি শিক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ে। হিন্দু কলেজের পঠন-পাঠনের মান বেশ উঁচু ছিল। ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহ, তৎসহ ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান ছিল হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। হিন্দু কলেজ থেকে নব্য বাংলার প্রধান নেতারা ছাত্র হিসেবে পাশ করেন এবং বাংলায় নবজাগরণে বিশিষ্ট ভূমিকা নেন। প্রকৃতই হিন্দু কলেজ বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই হিন্দু কলেজই রূপান্তরিত হয় আজকের স্বনামখ্যাত প্রেসিডেন্সী কলেজে।[৫]

কলকাতার বাইরের জেলাগুলিতেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি-স্কুল স্থাপিত হয়। টাকীতে টাকীর জমিদার একটি ইংরেজি-স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়াও দেখা যায় বাংলার জমিদাররা বেশ কয়েকটি জেলায় ইংরেজি-স্কুল স্থাপন করেন। ১৮২৮ সালে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে রাজশাহীতে একটি বেসরকারি ইংরেজি-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৬ সালে হাজী মুহম্মদ মোহসীন ফান্ড-এর অর্থানুকূল্যে হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় মোহসীন কলেজ, 'এডিনবরা রিভিউ' কলেজটির প্রতিষ্ঠাকে 'ভারতে জ্ঞানচর্চার দ্বারা উন্নতি সাধনের নবযুগের সূচনার অন্যতম প্রতীক' হিসেবে অভিনন্দন জানায়।[৬] কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে।

মিশনারি উদ্যোগ: বাংলায় (বাংলাদেশে) ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে খ্রিস্টধর্ম প্রচারক বা মিশনারিদের অবদান ছিল ব্যাপক ও গভীর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিন জন ইউরোপীয় ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়ম কেরি, যশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই তিন জন মিশনারি খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শতাধিক মিশনারি স্কুল স্থাপন করেন, যার পাঠ্যসূচিতে আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব স্কুলে নিম্নবিত্তের লোকেরাও তাদের সন্তানদের পাঠিয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

১৮০০ সালে উইলিয়ম কেরি 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস' স্থাপন করে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির স্বাক্ষর রাখেন, যেখানে পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি কাঠের হরফ ব্যবহৃত হত। বাইবেলের বাংলা অনুবাদ, হিতোপদেশ ও কথোপকথন নামে তিনটি বিখ্যাত পুস্তক ছাপা হয় শ্রীরামপুর

মিশন প্রেস থেকে। কেরির কথোপকথন বাংলার সমকালীন সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করে। এছাড়া উইলিয়ম কেরির সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' এবং 'ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া' নামে আর একটি সংবাদপত্র ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে। এসব পত্রিকাসমূহ সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এসব প্রকাশনাসমূহ সন্দেহাতীতভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৮১৭ সালে মিশনারিগণ 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেন। এই সোসাইটি প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থসমূহের হাজার হাজার কপি মুদ্রণ করে।

১৮১৮ সালে উইলিয়ম কেরি ও তাঁর দুই সহযোগী মার্শম্যান ও ওয়ার্ড তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেন 'শ্রীরামপুর কলেজ।[৭] এটি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এখানে এশীয় খ্রিস্টান এবং অন্যান্য যুব সম্প্রদায়কে একই সঙ্গে প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পড়ানো হত। সেকালে 'হিন্দু কলেজে' ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল কেবল উচ্চবিত্তের মুষ্টিমেয় ছাত্রের মধ্যে। সর্বসাধারণের পড়বার সুযোগ সেখানে ছিল না। কেরি এবং তাঁর সহযোগীগণ সর্বসাধারণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং এ লক্ষ্যেই তাঁরা শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হচ্ছে সর্বপ্রথম এবং এখন পর্যন্ত ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ধর্ম, মানবিক বিদ্যা এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় একই সঙ্গে পড়ানো হয়।

উইলিয়াম কেরি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করলেও বিশেষ উদারপ্রাণ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার আবশ্যকতার কথা বলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার জন্য মত প্রকাশ করেন। ১৮২০ সালে বিশপ্স মিডলটনের সম্মানে কলকাতায় বিশপ্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া লন্ডন মিশনারি সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতি খ্রিস্টিয় প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৩০ সালে স্কটিশ মিশনারি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে নতুন বেগ সঞ্চারিত হয়। ডাফ ছিলেন স্কটল্যান্ডের সেন্ট এ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র। ব্রিটিশ ভারতে আগত মিশনারিদের মধ্যে আলেকজান্ডার ডাফ ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি এবং ভারত সরকারের শিক্ষামূলক এবং সামাজিক নীতিমালা বিষয়ে তাঁর ব্যাপক প্রভাব ছিল। ইংরেজ-জাতির সত্যিকারের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ১৮৩০ সালের ১৩ জুলাই আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় ফিরিঙ্গি কমল বোসের গৃহে 'Genenal Assembly's Institution' নামে এক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৮] পরে ১৮৩৫ সালে এই বিদ্যালয় তার নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং এটি 'স্কটিশ চার্চ কলেজে' পরিণত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাঙালি যুবাদের পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করেন। ডাফের শিক্ষাদানের আন্তরিকতায় অল্পকালের মধ্যেই স্কটিশ চার্চ কলেজের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজান্ডার ডাফ ইংরেজি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার ওপর জোর দেন। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে'র রচনা থেকে জানা

যায় যে, ডাফের কলেজের শিক্ষার মান ছিল উঁচু। এই কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা স্বয়ং লেডী এ্যাকলে ইডেন পরীক্ষা করতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ ব্যতীত জেসুইট মিশনারিরা ১৮৩৫ সালে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার বাইরেও মিশনারিরা বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

সরকারি উদ্যোগ: কোম্পানিশাসিত বাংলায় কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টে ভারতীয় জনসাধারণের জন্য শিক্ষার যে কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে এ দেশীয় স্বল্পসংখ্যক লোককে অবয়ব ও আকৃতিতে স্বদেশীয় রেখেও রুচি ও আদর্শে ইংরেজ বানানো। লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন, ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের শিক্ষাধারাকে ভারতে সরকারিভাবে শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। কেননা, এর পূর্বে কোম্পানি শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করলেও শিক্ষা যে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব, একথা স্বীকার করেনি, চার্টার অ্যাক্টের ৪৩ নম্বর ধারায় শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থব্যয় এই তিনটি দায়িত্ব শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রথম স্বীকৃতি পায়। এই ধারায় ভারতে জনশিক্ষার খাতে একলক্ষ টাকা ধার্য করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু চার্টার অ্যাক্টের ভাষায় এমন কতকগুলো মারপ্যাঁচ ছিল যার ফলে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের এক কণাও শিক্ষার কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ১৮২৩

বেঙ্গল প্রদেশের জনসাধারণের শিক্ষাদান কার্য পরিচালনার জন্য ১৮২৩ সালে দশ সদস্যবিশিষ্ট 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠিত হয়।[৯] চার্টার অ্যাক্ট কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত একলক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করার জন্য কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে আরবি ও সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক বেশি থাকায় কমিটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে:

ক) কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন;
খ) ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন;
গ) দিল্লী ও আগ্রায় দুটি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয় স্থাপন;
ঘ) আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির ছাপা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দেশীয় পণ্ডিতবর্গ নিযুক্ত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইংরেজি পুস্তকসমূহ প্রাচ্যভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

কমিটির উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ ভারতীয় শিক্ষিত মহলের নিকট হতে অনুকূল সাড়ার পরিবর্তে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। বাধাদানকারী দলের নেতা রাজা রামমোহন রায় কমিটির কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে নাকচ করার জন্য বড়লাটের কাছে অভিযোগ পেশ করেন। কিন্তু অভিযোগ ফলদায়ক হয়নি এবং ১৮২৪ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজি শেখার দাবি প্রবল আকার

ধারণ করে। কিন্তু কমিটির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কমিটির প্রধান সদস্যরা প্রাচ্যশিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎসাহদানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নবীন সদস্যরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের পক্ষাপাতী ছিলেন। কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা সমান সমান থাকার ফলে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং কাজ কর্মে অচলাবস্থা দেখা দেয়। ইতোমধ্যে সমসাময়িক ইউরোপের উদারনৈতিক চিন্তাধারার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড মেকলে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের কাউন্সিলের আইন-সংক্রান্ত সদস্যরূপে ভারতে আগমন করেন ১৮৩৪ সালের ১০ জুন। লর্ড বেন্টিংক তাঁকে শিক্ষা কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। মেকলে ছিলেন ঘোর পাশ্চাত্যবাদী। সংস্কৃত ও প্রাচ্য শিক্ষাকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বাগ্মী ও লেখকের কলমের এবং বক্তৃতার জোর ছিল অসাধারণ। তিনি ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির অনুসারী গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা দেহের দিক থেকে ও গায়ের রংয়ের দিক থেকে ভারতীয় হলেও রুচি ও মানসিকতার আদর্শে ইউরোপীয় হয়ে যাবে। সেটাই হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত জয়।" যে সকল রাজপুরুষ আশংকা প্রকাশ করেন যে, আমেরিকার উপনিবেশের মত, ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি শিখলে, ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা চাইবে, মেকলে তাদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, "সেদিন আসতে এক শতাব্দী দেরী আছে। যদি সেইরকম দিন আসে তবে সেটাই হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শ্রেষ্ঠ সফলতা।"

মেকলের বিখ্যাত মিনিট ও বেন্টিংকের শিক্ষা রেজুলেশন, ১৮৩৫

ভারতে শিক্ষাধারার পদ্ধতি নিয়ে বিবদমান কমিটি গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের শরণাপন্ন হলে বেন্টিংক বিষয়টি মেকলের নিকট উপস্থাপন করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত চেয়ে পাঠান। এ বিষয়ে প্রাচ্যবাদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রবক্তা প্রিন্সেপ-এর সঙ্গে মেকলের সুদীর্ঘ ও সিদ্ধান্তমূলক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লর্ড মেকলে এক বিখ্যাত স্মারকলিপি বা মিনিট রচনা করে গভর্নর জেনারেল বেন্টিংকের কাছে পেশ করেন। মেকলের মিনিটকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে দিকচিহ্ন বলা হয়। মেকলে তাঁর মিনিটে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে দীর্ঘদিনের বিতর্কিত বিষয়ের অবসান ঘটান। মেকলের প্রতিবেদনের (মিনিটের) সুপারিশ অনুসারে লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ একটি রেগুলেশন দ্বারা এদেশে ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারকে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন।[১০]

মেকলের মিনিট কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলই নয়, সেটি একটি বিরাট সাহিত্যমূল্যসম্পন্ন রচনাও বটে। বাকচাতুর্য ও নাটকীয়তায় এ দলিল ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে ভারতীয় বিষয়াবলীর ওপর এডমন্ড বার্ক প্রদত্ত ভাষণগুলির সঙ্গে তুলনীয়। তবে পার্থক্য এই যে, বার্ক-এর বাগ্মিতার লক্ষ্য ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা। আর মেকলের বক্তব্য ছিল ভারতের জনগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে।

একজন উদারনৈতিক চিন্তাবিদ ও অত্যন্ত উঁচুস্তরের বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্ত্বেও মেকলে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের সমস্যাগুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের ভাষা তিনি জানতেন না, ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। আর এই পটভূমিকায় ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে তিনি যে তীব্র-তীক্ষ্ম মন্তব্য করেছেন, তাতে সস্তা ও অতি অহং এর প্রবণতাই প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর অর্জন অসাধারণ। কিন্তু অ-ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি তৎকালে যে মনোভাব প্রচলিত ছিল, জাতিগোষ্ঠীগতভাবে তিনি তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

লর্ড বেন্টিংক গণশিক্ষার জন্য ব্যাপকহারে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারেন নি। শিক্ষাখাতে সরকারি অর্থের বরাদ্দ এতই কম ছিল যে, ব্যাপকহারে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল না। এজন্য বেন্টিংক নিম্নমুখি পরিস্রাবণ তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ফিল্টারের জল যেমন ওপর থেকে নীচে নামে, সেরূপ শিক্ষিত লোকেরা অপর লোকদের শিক্ষিত করবে এবং এভাবে ইংরেজি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

পরিস্রাবণ নীতি গৃহীত হবার পর বাংলার জেলা সদরদপ্তরগুলিতে ক্রমে ক্রমে বেশ কিছুসংখ্যক সরকার পরিচালিত, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ গড়ে ওঠে। এসব স্কুল-কলেজ ইংরেজির সঙ্গে ইংরেজির মাধ্যমে বিজ্ঞানও পাঠ্যক্রমভুক্ত করা হয়। এছাড়া বেন্টিংক গোত্রবর্ণ নির্বিশেষে দেশীয় তরুণদের ইউরোপে প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ১৮৩৫ সালে 'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে রীতিসিদ্ধ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাচ্যে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় ভারতবর্ষের চিকিৎসা শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়।[১১] নিম্নমুখী পরিস্রাবণ নীতি প্রবর্তনের ফলে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ইংরেজ সরকারের অনুকূলে কাজ করার মত একটি শ্রেণী আপাতত সৃষ্টি হলেও এই নতুন শিক্ষা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই শিক্ষা পরিশ্রুত হয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছুবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যেমন করে ধারণা করেছিলেন তা আর কার্যকর হল না; বরং শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করলো এবং ফলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগতই অবনতির দিকে যেতে থাকলো। নিম্নমুখি পরিস্রাবণ নীতি গৃহীত হবার বহু বছর পরে লর্ড কার্জন স্বীকার করলেন যে, এই নীতির ফলে দেশীয় ভাষা ও পাঠ্যপুস্তকসমূহের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে ১৮৩৫-১৮৩৮ সালে প্রণীত উইলয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে লর্ড কার্জনের কথার সত্যতাই প্রতিফলিত হয়েছে।

ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের আরো দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। এর একটি হচ্ছে ১৮৩৭ সালে সরকারি অফিস আদালতসমূহে ফার্সির বদলে ইংরেজি ভাষা চালু এবং অপরটি হচ্ছে ১৮৪৫ সালে সরকারি চাকরিতে ইংরেজি শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার প্রবর্তনের নীতি প্রবর্তন[১২] এর আগেই ১৮৪৩ সালে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে লোপ করে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয় এবং পূর্বের কমিটির সকল দায়িত্ব নতুন কমিটিকে দেয়া হয়। ১৮৪৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, সরকারি চাকরিতে যোগদানের জন্য কাউন্সিল অব এডুকেশন

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবে এবং ইংরেজি জানা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজ, ১৮৪৩ সালে কলকাতায় শীল্‌স কলেজ এবং ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে বাংলায় আরো ছয়টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ১৮৫৩ সালে কলকাতায় হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ এবং বহরমপুরে বহরমপুর কলেজ। একই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ রূপান্তরিত হয় কলকাতার বিখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে।

এভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের মাটিতে বিকাশলাভ করলেও এর পুরোটাই অনেকখানি এলোমেলো ও খামখেয়ালিভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড অভাব ছিল সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালার এবং একে নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও পরিচালনা করার মত দক্ষ সুবিন্যস্ত সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের। এরকম অবস্থার মধ্যদিয়ে ১৮৫৩ সালে চার্টার আইন নবায়ন করে নেয়ার সময় আসে। চার্টার আইন নবায়নের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে। এরই ভিত্তিতে বোর্ড অব কন্ট্রোলের তৎকালীন সভাপতি স্যার চার্লস উড ১৮৫৪ সালে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন।

উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪

উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রকৃত অর্থেই ছিল ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং এটি উপমহাদেশের পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। একশত অনুচ্ছেদ সম্বলিত দলিলটিতে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ‘ইংরেজি ও স্বদেশী উভয় ভাষায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর সুদূরপ্রসারী বিস্তার’ ভারত সরকারের জন্য ‘পবিত্র কর্তব্য’ এ কথাকে ধরে নিয়েই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রস্তাবটিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।[১৩] এগুলি হলো:

১. শিক্ষা প্রশাসনের জন্য একটি আলাদা বিভাগ গঠন;
২. তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;
৩. সকল প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গঠন;
৪. পূর্বস্থাপিত সরকারি কলেজ ও উচ্চবিদ্যালগুলির তত্ত্বাবধান এবং যখন প্রয়োজন তখনই নতুন স্কুল-কলেজ স্থাপন;
৫. নতুন মিডল স্কুল প্রতিষ্ঠা;
৬. দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্যদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি প্রদান এবং
৭. ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য অনুদান প্রদানের একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন।

উডের প্রস্তাবটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আওতার মধ্যে রেখে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বের ওপর সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চপর্যায়ে ইংরেজি হবে শিক্ষার মাধ্যম আর নিম্নপর্যায়ে হবে দেশীয় ভাষা। অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা হবে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ওপর ভিত্তি করে। একটি গ্রেডভিত্তিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং নারীশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের থাকবে সরল ও আন্তরিক সমর্থন।

উডের প্রস্তাবটিতে উপসংহারে এ মন্তব্য করা হয় যে, সরকারি, বিশেষ করে উচ্চপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি নিরাপদেই বন্ধ বা এর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এবং এর অনুদান আসবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। উডের উল্লিখিত সুপারিশসহ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ধীরে ধীরে বাংলায় বিকাশ লাভ করে। ১৮৫৪ সালেই সরকারি শিক্ষাদপ্তর বা ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন খোলা হয়। প্রধান জেলাশহরগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য অনুকরণীয় মডেল হিসেবে সরকারি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন অনুদান প্রথার (গ্রান্ট-ইন-এইড) আওতায় ১৮৫৫ সালে বাংলায় প্রায় ৭৯টি উচ্চ-ইংরেজি ও ১৪০টি মধ্য-ইংরেজি-স্কুল সরকারি আর্থিক সাহায্য পায়। এই প্রথা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠাকে উৎসাহিত করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন তুলনামূলকভাবে কম এবং ভর্তির নিয়ম-কানুন অধিকতর শিথিল ছিল। সরকারের লক্ষ্য ছিল খরচ না বাড়িয়ে শিক্ষাকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলা এবং এ লক্ষ্যে অনেকখানি সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই।

উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। ঐ সময় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুধু পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে বিরাজমান পরিস্থিতিতে লন্ডন মডেলই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। কারণ কম খরচে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর সম্ভব ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৮৫৭

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর শাসনামলে (১৮৫৬-১৮৬২) বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৮৫৭ পাস হয়। এই আইন বলে ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের প্রস্তাবনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মহারাণীর অধীনস্থ সকল শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের প্রজাদের নিয়মিত ও উদারনৈতিক শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং একই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা-র বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষার মাধ্যমে সকল ব্যক্তির দক্ষতা নিরূপণ করা এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ একাডেমিক ডিগ্রী প্রদান করা।[১৪]

বোম্বে এবং মাদ্রাজের অপর দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথম দিকে চারটি অনুষদ ছিল- কলা ও বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল। অধিভুক্তিকরণ ও পরীক্ষা গ্রহণই ছিল এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। এগুলির নিজেদের কোনো শিক্ষাদান কার্যক্রম ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত এ অবস্থাই বিদ্যামন ছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শুধু বাংলা নয় সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এক বৈপ্লবিক ঘটনা। কেননা যদিও একই সাথে বোম্বে এবং মাদ্রাজেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেও পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ, শিক্ষার মান ও খ্যাতি অন্য দু'টিকে বহু পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। সেই সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তরুণরা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলায় তো বটেই এমন কি সারা ভারতবর্ষেও তাদের কৃতিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। এই যুবকদের কীর্তি যেমন একদিকে ছিল শিক্ষা ও প্রশাসনিক অঙ্গনে, তেমনি ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও— যা পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের জন্মলাভে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২ (হান্টার কমিশন)

উডের ডেসপ্যাচের সময়কাল থেকে পরবর্তীকালীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বড়লাট লর্ড রিপন তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টারকে সভাপতি করে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। সরকারিভাবে এটি ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন, ১৮৮২, নামে পরিচিতি লাভ করলেও কমিশনের সভাপতি উইলিয়ম হান্টারের নামানুসারে এটি 'হান্টার কমিশন' নামে সমধিক পরিচিতি। উপমহাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি নীতি ও ভূমিকার দিক নির্দেশনা দেওয়া ছিল হান্টার কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয় পর্যালোচনা করে। সেই সাথে কমিশন উচ্চশিক্ষা বিষয়েও পর্যালোচনা করে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাবনা সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ একখানি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে।[১৫]

কমিশনের সুপারিশ মালার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক ছত্রিশটি সুপারিশের অন্যতম ছিল প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুপারিশ। এছাড়া পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান, সম্ভবপর স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামীণ পরিবারের সুবিধানুযায়ী বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময় নির্ধারণ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ প্রভৃতি সুপারিশ উল্লেখযোগ্য।

সমাজের সুষম অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষারও সমভাবে প্রয়োজন আছে মনে করে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়েও তেইশটি সুপারিশ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল করে শিক্ষাকে বহুমুখি ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কমিশন সেভাবে পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করার সুপারিশ করে।

ভারত সরকার হান্টার কমিশনের দেওয়া প্রায় সকল সুপারিশই অনুমোদন করে। কিন্তু কমিশনের অনেক সুপারিশই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবুও আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসেবে হান্টার কমিশনের গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায়

নেই। কেননা, হান্টার কমিশনই এদেশে সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে স্বীকার করে এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। বলা যায়, কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার মন্থর অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন গতিশীলতা আনয়ন করে। অন্যদিকে কমিশন কর্তৃক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহদানের সুপারিশের ফলে উপমহাদেশের উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষারও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাতেই উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে সর্বাধিক। কারণ অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশগুলোর তুলনায় বাংলায় উচ্চশিক্ষা ছিল মোটামুটি সস্তা। কলেজ ছাত্রপ্রতি গড় বার্ষিক ব্যয় এবং ছাত্রপ্রতি বেতনও সর্বাপেক্ষা কম ছিল বাংলায়। কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রও সবচেয়ে বেশি ছিল এখানে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলার অবস্থা ছিল ভারতীয় সব প্রদেশের শীর্ষে। ১৯০১-০২ সালে ভারতের ৩০৯৭ টি ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেকই ছিল বাংলায়। এখানে প্রতি ১০৪ বর্গমাইলে একটি করে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। কলেজগুলোর মতো এসব স্কুলেরও অধিকাংশ ছিল বেসরকারি। এসব স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যাও এখানে ছিল সবচেয়ে বেশি এবং এদেরই সংখ্যা বেড়ে চলছিল তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে।

তবে সংখ্যায় বাড়তে থাকলেও তদনুযায়ী এখানে লেখাপড়ার গুণগত মানের তেমন উন্নতি হচ্ছিল না। জনাকীর্ণ শ্রেণিকক্ষ, অপর্যাপ্ত ভবন ও সাজ-সরঞ্জাম, স্বল্পবেতনভুক্ত অযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিম্নমানের পাঠ্যক্রম, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও অঞ্চলভেদে শিক্ষার অসম বিস্তার, মানববিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক প্রভৃতি কারণে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইন, ১৯০৪

এ সময় লর্ড কার্জন উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মনোযোগী হন এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। লর্ড কার্জন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আইন, ১৯০৪[১৬] এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লিখিত গলদগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এর পশ্চাতে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সরকার কর্তৃক অনিয়ন্ত্রিত, সস্তা ও নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা বিক্ষুব্ধ ব্রিটিশ বিরোধী নাগরিকই তৈরি করছে, কাজেই এর রশি টেনে ধরতে হবে। কিন্তু এর প্রতিবিধানকল্পে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে যে ব্যবস্থা তিনি নিলেন তাতে তাঁর অভীষ্ট পুরোপুরি সিদ্ধ হয়নি, এতে মানের উন্নতি তেমন সাধিত হয়নি, শিক্ষার সম্প্রসারণ শ্লথ হয়নি বরং শিক্ষাকাঠামোর ভারতীয়করণ আরো ত্বরান্বিত হয়। ফলে উচ্চস্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আগের মতোই নাগালের বাইরে থেকে যায়।

এভাবে কার্জনীয় সংস্কারের পটভূমিতেই সূচিত হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা ও চরিত্র পরিবর্তনের পালা। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ ছিল সিলেবাস তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান, কলেজগুলি অধিভুক্তিকরণ এবং বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতিদান করা। শিক্ষাদানের আসল দায়িত্ব অর্পিত ছিল কলেজগুলির ওপর। বিশ শতকের

প্রথম দশকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম নিজস্ব পরিচালনায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ও উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম চালু করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯১৭ (স্যাডলার কমিশন)

অল্পসময়ের মধ্যেই পুরো স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কার্যক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এর পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার কেন্দ্র হিসেবেও এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এসব করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সরকারের বিরোধ দেখা দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচির দ্রুত বিস্তার ঘটার ফলে প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিষয়ে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি তদন্ত করে দেখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংগঠনের জন্য করণীয় কাজ নির্ধারণের নিমিত্তে ভারত সরকার কর্তৃক ১৯১৭ সালে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয়। ইংল্যান্ডের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম.ই স্যাডলার ছিলেন কমিশনের সভাপতি। তাঁর নামানুসারে এটি স্যাডলার কমিশন নামেই সমধিক পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেনঃ র‍্যামজে মুইর, জে. ডব্লিউ গ্রেগরি, পি.জে হার্টস, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জিয়াউদ্দিন আহমদ, ডব্লিউ, ডব্লিউ হর্নেল এবং জর্জ এন্ডারসন।

১৯১৭ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্যাডলার কমিশন প্রথমবারের মতো মিলিত হয়। কমিশনের সভাপতির পরামর্শক্রমে কমিশনের সদস্যরা কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাদের অনুসন্ধানকার্য সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেন। দীর্ঘ সতের মাস প্রত্যক্ষ পরিদর্শন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি গভীর পর্যালোচনার পর কমিশন ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ ভারত সরকারের কাছে তের খণ্ডে সমাপ্ত বিশালাকার রিপোর্ট পেশ করেন।

স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশমালা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত দিকের ওপর আলোকপাত করে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা যথাশীঘ্র বাস্তবায়ন করা ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া কমিশন বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাকে সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। এতদুদ্দেশ্যে কমিশন একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠনের সুপারিশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার জন্য একটি বিশেষ বোর্ড গঠনের আহ্বানও জানিয়ে ছিল কমিশন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় ভারতীয় ভাষার স্থান নির্ধারণ, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন, ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে পৃথকীকরণ প্রভৃতি সুপারিশ ছিল কমিশনের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

শিক্ষা-সংক্রান্ত পূর্বের কমিশনগুলোর মতো স্যাডলার কমিশনের অনেক সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি সরকার ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে। এছাড়া কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ নিয়ে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। ফলে তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটেনি।

তবে স্যাডলার কমিশনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এর ফলে একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) মানুষের জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি পূর্ববঙ্গের কলেজগুলোর দায়িত্ব থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অব্যাহতি পায়।

এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে স্যাডলার কমিশনের মতো শিক্ষা সম্পর্কে এত মূল্যায়ন আর কোনো রিপোর্টে করা হয়নি। শিক্ষার এমন কোনো দিক নেই যা স্যাডলার কমিশনে আলোচিত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ্য করে এই কমিশন গঠিত হলেও সারা ভারতের শিক্ষাপ্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য স্যাডলার কমিশনের সুপারিশমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্যাডলার কমিশন গঠনের পরবর্তী ত্রিশ বছরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের ভারত ছাড়ার পূর্বকাল পর্যন্ত, বাংলা তথা উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। সে পরিবর্তন কখনো খুবই দ্রুত হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ কখনো ধীর কখনো মন্থর গতিতে হলেও অব্যাহত থেকেছে।

তবে একথা ঠিক যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলে দেশীয় ভাষাশিক্ষা অবহেলিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ইংরেজ সরকারের অনুকূলে কাজ করার মত একটি শ্রেণি আপাতত সৃষ্টি হলেও এই নতুন শিক্ষা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ফলে গ্রামদেশের মাটির কাছাকাছি মানুষগুলোর জন্য ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থা বাঞ্ছিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। বরং শিক্ষার ক্ষেত্রেও শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করে জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের জনশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। অথচ মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়া হলে ইংরেজি-ভাষার বাধা অতিক্রম করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটতো। এজন্য অনেক শিক্ষাবিদ ভারতবাসীর ওপর অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইংরেজি-ভাষা শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেয়ার নিন্দা করেন।

অপরদিকে, ইংরেজি শিক্ষার সুফলও কম ছিল না। উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার সূচনাকালে উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, ইংরেজি-ভাষার মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার চর্চা যতই বিস্তার লাভ করে, শিক্ষার চরিত্রটি ততই যুক্তিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে থাকে। ফলস্বরূপ এই শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে উপমহাদেশে এক যুক্তিবাদী শিক্ষিত শ্রেণির উদ্ভব হয় যাঁরা ছিলেন বাংলা

তথা ভারতের নব-জাগরণের অগ্রদূত। এঁরা সমাজের জড়তা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দূর করে প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক নবীন সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন। এঁরাই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রপথিক। এঁদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসেন ভারত-পথিক রাজা রামমোহন, ধর্মসংস্কারক ও প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ ও আরো অনেকে। মুসলিম সম্প্রদায় গোড়ার দিকে রক্ষণশীলদের প্রভাবে ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও পরে তারা স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আব্দুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের প্রভাবে এই শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসেন। ফলস্বরূপ এদেশে একটি মননশীল মুসলিম নব্য শ্রেণীরও জন্ম হয়।

তথ্যসূচি:

---

১ Thomas F.W., The History and Prospects of British Education in India, p. ১.

২ Abdul Karim, Mohammedan Education in Bengal, Calcutta, ১৯০০, p. ১.

৩ Wakil Ahmed, Unish Shatakey Bangali Massalmner Chinta-chetonar Dhara, Vol. ১, p. ২৮.

৪ Bangladesher Itihash (১৭০৪-১৯৭১), Vlo-৩, p. ১০১-১০২.

৫ Shamsul Hoque, Uchchasshiksha: Bangladesh, p. ১১-১২.

৬ Banglapedia, Vlo. x, p. ৪৮৬.

৭ Banglapedia, Vol- 9, p. 454; Life of Duff, an article by Lalbehai Day in recollection of Dr. Duff.

৮ H.V. Hampton, Biographical Studies in Modern Indian Education, p. ৮৫.

৯ H.V. Hampton, Biographical Studies in Modern Indian Education, p. ৪১.

১০ (১/৯৮) C.E. Trevelyan onther Education of the people of India, p.11 ; Thevelyan (ed)- Life of Macaulay, p. ২৯৯-২২০.

১১ H.V. Hampton, op.cit., p. ৯৯.

১২ Sirajul Islam (ed), op.cit., p. ১০২.

১৩ Arthar Howell, Education in British India prior to ১৮৫৪, p. ৩৩.

১৪ Ibid. p. ১৯৮-১৯৯.

১৫ W.W. Hanter, Report of the Indian Education Commission, ১৮৮৩.

১৬ Handred Years of the University of Colcatta, p. ১৪২.